আস্কিতা বনাম নাস্কিতা

আমি একজন আস্কি।

যদি প্রশ্ন করা হয় কেন আমি আস্কি - তার সবচেয়ে সহজ যে জবাবটি হাতের কাছে রেডী আছে- তা হলো - আস্কি হওয়া সোজা। পুর্বপুর"ষদের বিশ্বাস ও পারিপার্শিক সমাজব্যবস্থা আমাদের জেনেটিক কোডে ও আমাদের মনে আস্কিতার বীজ আপনা আপনিই বুনে দেয়। আমরা নিজের অজান্তেই আস্কি হয়ে যাই। তাছাড়া আমাদের সামনে এতবড় একটা সৃষ্টি রয়েছে, এর একজন সৃষ্টিকর্তা না থেকে কি পারে, কারণ ছাড়া কি কোন কার্য্য হয় - এই চলতি যুক্তি তো হাতের কাছে মওজুদ আছেই। পক্ষান্তরে নাস্কি হওয়া খুব কঠিন কাজ। জন্মসুত্রে প্রাপ্ত এবং মনের গহনে প্রোথিত আস্কিতার বৃক্ষটিকে বুদ্ধি এবং লজিক দিয়ে উপড়ে ফেলে সেখানে নাস্কিতার বীজ বোনা কোন সহজ কাজ নয়। ধর্ম-পরিবর্তনের মতোই একটি অতি কঠিন কাজ এটি। নাস্কি হওয়ার জন্যে যে পরিমান হলুদ পদার্থ মস্কের ভেতর থাকা দরকার, এজন্মে আর তার অধিকারী হতে পারলাম না। এপ্রসংগে নজর"লের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। কাঠমোল্লারা যখন তাকে নাস্কি ও কাফের আখ্যায় আখ্যায়িত করেছিল তিনি হেসে বলেছিলেন - 'যাক্, এতদিনে কাফের হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছি তা'হলে'। নাস্কি হওয়া যে সোজা কাজ নয়, নজর"ল তা বুঝেছিলেন, তাই হয়তো এমন সরস জবাব দিতে পেরেছিলেন।

তবে নিজে আস্কিধর্মের অনুসারী হলেও নাস্কিদের আমি ঘৃনা করি না। পৃথিবীতে প্রতিটি লোকের নিজ বিশ্বাসমত চলার ও বাঁচার অধিকার রয়েছে, ঘৃনা শুধু ঘৃনারই জন্ম দেয়। কেউ যদি নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে নাস্কিধর্মকেই বরণীয় বলে মনে করে, তাকে বাঁধা দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। সুতরাং নাস্কি বন্ধুদের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা রেখে আমার আস্কিতার স্বরূপের উপর সামান্য আলোকপাত করাই অত্র লেখার মুল উদ্দেশ্য।

আগেই বলেছি আস্কিবাদ আমাকে কষ্ট করে অর্জন করতে হয়নি। আলো বাতাসের মতো সহজভাবেই তা আমি জন্মসুত্রে লাভ করেছি। বয়স বাড়ার সাথে সাথে মাঝে মাঝে সংশয় যে আসেনি তা নয়, জীবন ও জগতের বহু ঘটনায় মনে হয়েছে আসলেও সৃষ্টিকর্তা বলে কিছু আছে কি ? যদি সত্যিই সৃষ্টিকর্তা নামক অল-পাওয়ারফুল কোন সত্তা থেকে থাকেন, জীবজগতে এত অত্যচার অনাচার দেখেও তার আসন টলে উঠে না কেন ? ধর্মগ্রন্থসমুহ হতে সৃষ্টিকর্তার যে ছবি পাই, তাতে দেখা যায় তিনি অসীম ক্ষমতাধর একজন স্বে"ছাচারী রাজা। মানুষের মতোই তার রাগ আছে, রেগে গেলে তিনি মানুষের মতোই অভিশাপ দেন, এমনকি যার উপর রাগ হয় তাকে বা তার গোত্রকে সমুলে ধ্বংস করে ফেলতেও দ্বিধা করেন না। স্বে"ছাচারি রাজাদের মতোই তিনি চাটুকারিতা ভালবাসেন, কেউ দিনরাত তার স্বগান করলে তিনি খুবই খুশী হন। চাটুকারদেরকে তিনি প্রচুর ধনসম্পদ, হীরা মানিক্যে গড়া প্রাসাদ, এমনকি শত শত সুন্দরীশ্রেষ্ঠা প্রমোদসংগীনি উপহার দেন। পৃথিবীর রাজাদের মতোই তিনি তার রাজত্বের খোজখবর রাখার খুব একটা সময় পান না, তাকে হয়তো অন্য কোন রাজকীয় কাজে খুব বেশী ব্যস্ থাকতে হয়। নইলে বুশ-ব্লেয়ারেদের বোমায় যখন শত শত নির্দোষ নরনারী প্রাণ হারায়, তখন সিংহাসনে বসে তিনি কী করেন ? শ্রীকৃষ্ণের মতো প্রেমের বাশী বাজান ? রাম্স্ফিল্ড, ডিক চেনি, কন্ডোলিসা রাইসদের মতো দানবদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার কাছে বিশ্বের কোটি কোটি নরনারী জিম্মি, তবুও সৃষ্টিকর্তার বজ্র তাদের উপর নেমে আসে না কেন ? মোল্লা, পুরোহিত আর যাজকদের রমরমা ধর্ম-ব্যবসার কাছে সমস্ মানব সমাজ জিম্মী হয়ে থাকে

অনাদিকাল। কেন ? বিধাতা বলে সত্যিই যদি কেউ থেকে থাকেন তবে তথাকথিত অন্যায়ের বির"দ্ধে সংগ্রামে তার মনোনীতজনকে কেন নিজ হাতে তরবারী ধরে মানুষ হত্যা করতে হয় ? বিধাতার একটা ইশারাই তো সবকিছু ধ্বংস করার জন্যে যথেষ্ট। ধ্বংসই বা করতে হবে কেন ? তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি ই"ছা করলেই তো সমস্ মানুষ ভাল হয়ে যেতে বাধ্য। অথচ দেখা যায় দুনিয়ার লোকদের ভালমন্দের জন্য তাকে মানুষের প্রতি চেয়ে থাকতে হয় । ভাল করলেও মানুষেই করে, মন্দ করলেও মানুষেই করে । কেন ? তার ভুমিকা তাহলে কী ? মানুষকে হেদায়েত করার জন্য একজন মানুষকেই মনোনীত করার দরকার কী ? স্বর্গদুত ঈশ্বরের বাণী নিয়ে চুপি চুপি একজন মানুষের কাছে আসেন। কেন ? তার বদলে স্বর্গদুত যদি আকাশে নিজের জ্যোতির্ময় চেহারাটা প্রকাশ করে সমস্ মানুষকে সম্বোধন করে রাজাধিরাজের বাণীটি শুনিয়ে দিতেন তাহলে তো আর মানুষের মনে কোন সন্দেহ থাকত না। পাপী-তাপী সবাই সেই ঐশী বাণী নিজ কানে শুনতে পেতো, তখন আর কারও পক্ষে সেই বাণীর বির"দ্ধচারণ করার উপায় থাকত না। তা না করে স্বর্গদুত কিনা আমাদের মতোই আরেকজন মানুষের কাছে ইশ্বরের বাণী শুনিয়ে দিয়ে যান, তাও আবার কানে কানে ! সেই বাণী প্রচার করতে যেয়ে বেচারা সেই মানুষগুলিকে কি হেনস্াই না হতে হয়। এই সমস্ ভড়ংয়ের কোন অর্থ আছে ?
শুধু কি তাই ? ঈশ্বরের বানী হলে তা তো শ্বাশ্বত হওয়ার কথা। কিন্তু দেখা গেল বাণীগুলি যে যুগে নাজেল হয়, পরবর্তী যুগের সাথে তা আর ম্যাচ করে না। তাকে পরিবর্তন পরিবর্ধনের দরকার হয়। বিশ্বব্রম্মান্ডের সৃষ্টিকর্তা বলে যাকে আমরা বিশ্বাস করব, তিনি কি এতটাই খেলো ? সৃষ্টির বিশালতা ও বৈচিত্রের কথা ভাবতে গিয়ে সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষকেও হাবুডুবু খেতে হয়, তার মনে এই উপলব্ধি জন্মে যে সমস্ জীবনটা জ্ঞানসমুদ্রের বেলাভূমিতে নুড়ি কুড়াতেই কেটে গেল, সমুদ্রে অবগাহন করার সুযোগ আর হলো না। সেই বিরাট বিশাল সীমাহীন বিশ্বের সৃষ্টিকর্তাটি কিনা এত হাস্যকররকম ক্ষুদ্র ! এতগুলি কেন এবং কিন্তুর পর যদি কেউ মনগড়া সেই ক্ষুদ্র সৃষ্টিকর্তাটির উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে না পারে, তাকে নাস্ি ক বলে গালি হয়তো দেয়া যায় - তবে দোষ দেয়া যায় না।

আমার উপরের কথাগুলি নিশ্চয়ই নাস্িকের মতো শুনা"ছ বলে অনেকে সন্দেহ করতে পারেন। তবে সত্য কথা এই যে এতকিছুর পরও ভেতরের বিশ্বাসের বাতিটি আমি জ্বালিয়ে রাখতে পেরেছি, কীভাবে পেরেছি সেই আলোচনাই অত্র প্রবন্ধের মুল উদ্দেশ্য।

(ক) :- জীবন ও মরণ

হাউজ অব ফেইথ বা বিশ্বাসের ঘরের সবচেয়ে বড় তুর"পের তাস যেটি - সেটি হলো মৃত্যু। আরেক অর্থে বলা যায় জীবন। কারণ জীবন প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুরই আরেক রূপ। প্রকৃতিতে পরস্স্পর বিরোধী অথচ একে অন্যের পরিপুরক কিছু জিনিস বা ঘটনা (ইভেন্ট) আছে। এদের একটিকে ছাড়া আরেকটি অর্থহীন, অস্িত্বহীনও বলা যায়। একটি থাকলে আরেকটি অবধারিতভাবে থাকবেই। আলো দিয়ে অন্ধকারকে বুঝা যায়, তেমনি অন্ধকার দিয়ে আলোকে। একটি ছাড়া আরেকটির কোন অস্িত্ব নাই। অন্ধকার না থাকলে আলোর অস্িত্ব যেমন বোধগম্য হতো না, তেমনি হতো না আলো না থাকলে অন্ধকারের। ম্যাটার- এ্যান্টি ম্যাটার, ইলেকট্রন- পজিট্রন, নর- নারী, দিন- রাত্রি, ইহকাল- পরকাল ইত্যাদি হাজারো রকম পরিপুরক পদার্থ ও ঘটনার সমাহারে এই বিশ্ব ব্রম্মান্ডের সৃষ্টি। ঠিক একই নিয়মে জীবনের পরিপুরক ঘটনাটিই মৃত্যু। কিংবা বলা যায় মৃত্যুর পরিপুরক ঘটনাটির নামই জীবন । দিনের পর যেমন রাত আসে রাতের পর আসে দিন, ঠিক তেমনি জীবনের পরে আসে মৃত্যু কিংবা মৃত্যুর পরে আসে জীবন । জীবন ও মৃত্যু অনন্ জীবনচক্রের দুইটি ছেদবিন্দু মাত্র। জন্মবিন্দু ও মৃত্যুবিন্দুর মাঝামাঝি যে সময়কাল তা আমাদের খুব পরিচিত, তাই তাকে আমরা ভীষণভাবে

বিশ্বাস করি। কিন্তু মৃত্যুবিন্দু ও জন্মবিন্দুর মাঝামাঝি আরেকটি সময়কাল তো থাকতেও পারে; থাকতেও পারে কেন - থাকাটাই স্বাভাবিক। সেই সময়কাল আমাদের অপরিচিত বলে তা যে একেবারেই নাই তার প্রমান কী ? সুতরাং মৃত্যুর পরে আরেকটি জীবনের কল্পনা করা কি এতই অযৌক্তিক ?

জন্মপরবর্তী যে সময়কালটা আমাদের খুব পরিচিত তার স্বরূপই কি আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছি ? জীবনের স্বরূপ আমাদের কাছে এখনও অজানা। প্রোটিন কণা ও এ্যামিনো এ্যাসিডের মিশ্রনেই নাকি একটি পার্থিব জীবনকণা তথা জীবকোষের সৃষ্টি। একটি জীবকোষ ক্রমাগত বিভাজিত হয়ে একটি পুর্ণাংগ জীবের সৃষ্টি করে বলে বলা হয়ে থাকে। তবে প্রোটিন ও এ্যামিনো এ্যাসিড মিশালেই যে একটি জীবকোষ তৈরী হয়ে যাবে তা কিন্তু নয়। এর সাথে আরও কিছু একটা থাকা দরকার বিজ্ঞানীরা 'যে একটা কিছুর' নাম দিয়েছেন 'লাইফ ফোর্স'। প্রোটিন-এ্যামিনো এ্যাসিডে যে পর্য্যন্ এই লাইফ ফোর্স প্রবাহিত না হয় সে পর্য্যন্ একটি জীবকোষ চোখ মেলে তাকায় না। এই লাইফ ফোর্সের স্বরূপ কি, তা এখনও আমাদের অজানা। এই ফোর্স বা বল যে প্রকৃতিতে বিরাজমান আর চারটি বলের মতো বল নয়, তা নিশ্চিত। (বিদ্যুৎচুম্বকীয় বল, মহাকর্ষীয় বল, দুর্বল পারমানবিক বল ও সবল পারমানবিক বল - এই চারটিমাত্র প্রাকৃতিক বলকে বিজ্ঞানীরা শনাক্ত করতে পেরেছেন। প্রকৃতিতে আর যেসমস্ বল পরিলক্ষিত হয়, সেগুলি এই চারপ্রকারের মৌলিক বলের প্রকারভেদ মাত্র)। লাইফ ফোর্স আসলেই কী বস্তু তা চির রহস্যে ঢাকা। প্রকৃতির অন্যান্য বলগুলির সাথে পদার্থের বিভিন্নরূপ মিথষ্ক্রিয়ার ফলে বিশ্বের সমুদয় পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে বলে বলা হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের পরিমিত মিশ্রনে পর্য্যাপ্ত পরিমান বিদ্যুৎচুম্বকীয় বল প্রবাহিত হওয়ার ফলেই পানির সৃষ্টি হয়েছে। হাইড্রোজেন-অক্সিজেনের মিশ্রনের মধ্যে বিদ্যুৎশক্তি চালনা করে ল্যাবরেটরীতেও কৃত্রিম উপায়ে পানি তৈরী করা যায়। প্রাইমরডিয়াল (ঢ়ৎরসড়ৎফরধষ) বিশ্বে কীভাবে এ্যামিনো এ্যাসিড ও প্রোটিন মিশ্রিত হয়ে প্রথম প্রাণকনাটির সৃষ্টি হয়েছিল, চার্লস ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বে তার সাম্ভাব্যতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির যুগেও ল্যাবরেটরীতে এ্যামিনো এ্যাসিড ও প্রোটিন একত্রে মিশ্রিত করে একটি জীবকোষ তৈরী করা সম্ভব হয়নি। মানুষের জ্ঞান এই পর্য্যায়ে পৌছেচে যে সে ক্লোন করে হুবহু আরেকটি আস্ মানুষ তৈরী করে দিতে পারে। অথচ অতি ক্ষুদ্র একটি জীবকোষ তৈরী করতে পারে না। এর কারণ - জীবনের অন্র্নিহিত রহস্যময় যে শক্তির বলে এ্যামিনো এ্যাসিড ও প্রোটিন জোটবদ্ধ হয়ে একটি প্রাণকোষের সৃষ্টি করে, মানুষ এখন পর্য্যন্ তাকে ধরতে পারেনি। এই পার্থিব জীবনে নিত্যদিন অনুভব করা একটি ফোর্সকেই আমরা শনাক্ত করতে পারিনি, সেখানে অপার্থিব জীবনের তথা মৃত্যুপরবর্তী জীবনের না দেখা একটি ফোর্সকে আমরা কীভাবে শনাক্ত করব ? পৃথিবীতে জীবনের অন্র্লীন সেই শক্তিকে শনাক্ত না করেও আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে সে আছে । তাহলে অপার্থিব জীবনে সেইরূপ বা অন্যপ্রকারের কোন শক্তি যে থাকতে পারে - এই বিশ্বাস অযৌক্তিক হবে কেন ?

'মৃত্যুই পার্থিব জীবনের পরম পরিনতি, এ্যাবসলিউট এন্ড, একেবারে ফুল ষ্টপ' - এটা মেনে নিতে মানবমন কেঁদে উঠে। আমি আছি, ভীষণভাবে আছি। আশা-আকাংখা, কামনা-বাসনা, প্রেম-ভালবাসায় পরিপুর্ণ হয়ে আছি। ক'দিন পরেই আমি আর থাকব না, কোথাও না; ইহকালেও না পরকালেও না। এটা যদি সত্যও হয়, অত্যন্ রূঢ় সত্য, বিয়ের প্রথম রাতেই প্রেয়সীর মরে যাওয়ার মতো জঘন্য সত্য। স্বাভাবিকভাবেই অকাট্য প্রমান ছাড়া এইরূপ একটা সত্যকে মেনে নেওয়া যায় না। 'মৃত্যুর পরে আর কিছু নাই, আছে কেবল অনন্ শুন্যতা, এ্যান ইনফিনিটলি ভাষ্ট এম্প্লটিনেছ' - এই অনুসিদ্ধান্ এখনও প্রমানিত হয়নি। ঠিক তেমনি মৃত্যুর পর আরও একটি জীবন আছে, স্বর্গ-নরক আছে - এই থিওরিও এখনও

প্রমানিত হয়নি। এই দুইটি অপ্রমানিত অনুসিদ্ধান্তের কোনটি আমাদের কাছে বেশী গ্রহণযোগ্য সেটিই আমাদেরকে বিচার করে দেখতে হবে।

প্রথমতঃ- মৃত্যুর পর আছে কেবল শূন্যতা-- কথাটিতে শূন্যতা বলে একটি টার্ম আছে। শূন্যতা বলতে আমরা কী বুঝি ? শূন্যতার স্বরূপ কী ? শূন্যতা বলতে কি চরম অর্থহীনতা বুঝায় ? দর্শন ও বিজ্ঞান - কোনটাই কিন্তু তা বলে না। নেগেটিভ দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করে শূন্যতাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলে চলবে না, বরং পজেটিভ দৃষ্টিকোনে শূন্যতার স্বরূপ উপলব্ধি করতে হবে। এস্থলে পজিটিভ ও নেগেটিভ দৃষ্টিভংগীর একটু বিশদ বর্ননা দেয়া আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের এক উপন্যাসের নায়ক ছিল ঘোরতর নাস্কিক। তাকে যখন ঈশ্বর সম্স্লর্কে প্রশ্ন করা হলো তিনি বললেন - আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না কথাটা এমন নয়, আমি 'না-ঈশ্বরে' বিশ্বাস করি। তিনি নাস্কিক, তবে অবিশ্বাসী নন। তিনিও একজন বিশ্বাসী, কারণ তিনি 'না-ঈশ্বরে' বিশ্বাস করেন। অর্থাৎ তার নাস্কিকতা একটি হ্যা-বাচক বা পজিটিভ বিষয়, না-বাচক বা নেগেটিভ বিষয় নয়। তদ্রূপ শূন্যতা একটি পজেটিভ বিষয়, এক অর্থে শূন্যতা মানে পরম পুর্ণতা। শূন্যতার মাঝেই পুর্ণতা রূপ পায়। ঘর আমাদের নিত্যদিনের পরিচিত একটি জিনিস যার মধ্যে অধিষ্ঠান করে আমাদের সারাটি জীবন কাটিয়ে দেই। অথচ এই ঘরটির দিকে যদি আমরা নিরাসক্ত মনে ফিরে তাকাই, তবে সেখানে সীমাহীন শূন্যতা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাব না। মহাশূন্য গোটাকেয়েক ইটকাঠের ফ্রেমে আবদ্ধ হয়ে আমাদের চোখের সামনে একটি ঘর হিসেবে প্রতিভাত হয়ে উঠে। মন থেকে ইট-কাঠের ফ্রেমকে দুর করতে পারলে ঘরের মধ্যে শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই। দার্শনিকেরা তাই শূন্যতা-পুর্ণতাকে একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ হিসেবে বিবেচনা করেন, বলেন - **"That which is form is just that which is emptiness & that which is emptiness is just that which is form"**। অর্থাৎ - যা শূন্যতা, তাই পুর্ণতা। যা নিরাকার, তাই আকার। পদার্থ এবং শক্তি দুইটি আলাদা আলাদা বিষয়, অথচ আলাদা হলেও তারা আলাদা নয়। প্রকৃতপক্ষে পদার্থই শক্তি এবং শক্তিই পদার্থ। ঠিক একইভাবে পুর্ণতাই শূন্যতা এবং শূন্যতাই পুর্ণতা। আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন মহাবিশ্বে মোট যে পরিমান শক্তি ও পদার্থ আছে, তা নাকি সৃষ্টি হয়েছে এক মহা শূন্যতা থেকে। অর্থাৎ মহাবিশ্ব জুড়ে নিরন্তর ঘটে চলছে শূন্যতা ও পুর্ণতার লুকোচুরি খেলা। জীবনমৃত্যুও শূন্যতা -পুর্ণতার এই লুকোচুরি খেলার প্রকারভেদ ছাড়া আর কিছু নয়। মৃত্যুর মাঝ দিয়ে জীবনের মহাশূন্যতা সুচিত হয়, কিন্তু শেষ হয়ে যেতে পারে না। কারণ মৃত্যুরূপ শূন্যতার মাঝে রয়েছে মহাপুর্ণতার হাতছানি। সুতরাং মৃত্যুর পরেই সবকিছু শেষ হয়ে গেল বলে একটা প্রকান্ড যতিচিহ্ন টেনে দিয়ে বসে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। বরং এ এমন একটি কাজ যা মানুষের কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে শোচনীয়ভাবে সীমাবদ্ধ করে ফেলে।

দ্বিতীয়তঃ- মৃত্যুই জীবনের শেষ পরিণতি, এর পর আর কিছু নেই - এই অনুসিদ্ধান্ত মেনে নিলে জীবনটা অর্থহীন বলে মনে হয়, জীবনের বহু ক্রুশিয়াল প্রশ্নের জবাব মেলে না। এই পৃথিবীতে যে যেমন কাজ করে সে তেমন ফল পায়। খুন করলে ফাঁসিতে যেতে হয়, ভালভাবে লেখাপড়া করলে পরীক্ষায় ফার্ষ্ট ডিভিশনে পাশ করা যায়। আবার এও দেখা যায় যে অনেক কাজের প্রতিফল এই পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। সমাজে ক্ষমতাবান ভুরি ভুরি লোক রয়েছে যারা অসংখ্য মন্দ কাজ করেও দিব্বি মাথা উচু করে বেঁচে আছে, লাখ লাখ লোকের মৃত্যুর কারণ ঘটিয়েও সমাজে গণ্যমান্য হয়ে আছে। অপরদিকে অনাচার, অবিচার আর শোষনের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে একটি নিষ্ফল জীবনের ভার বহন করে কোটি কোটি লোককে ভুপৃষ্ঠ হতে বিদায় নিতে হ"ছ। কতো শিশু জন্মগতভাবে পংগু বিকলাংগতার অভিশাপ মাথায় নিয়ে পৃথিবীতে আসছে, একটি নিষ্ফল ব্যর্থ জীবন কাটিয়ে আবার চলে যা"ছ। শুধু ইহকাল তথা একটিমাত্র জীবনই যদি আমাদের অমোঘ পরিণতি হয়,

তা'হলে এইসব জীবনের কী অর্থ থাকতে পারে ? কী অর্থ আছে সততার, ন্যায়পরায়নতার, ভালোর, মন্দের, পাপের, পুণ্যের ? আমার জীবনের পরিণাম একটি প্রকান্ড শূন্যমাত্র, সুতরাং খামোখা কেন আদর্শ, ত্যাগ, মহত্ব, মহানুভবতা প্রভৃতি অলীক স্বর্ণমৃগের পিছে ছুটে বেড়ানো ? তার চেয়ে যেকোন উপায়ে এই ছোট্ট জীবনটাকে কানায় কানায় ভরিয়ে নিয়ে একে সর্বোতভাবে উপভোগ করাই কি বুদ্ধিমানের কাজ হয় না ?

পক্ষান্তরে এমন যদি হয় যে আমার এই জীবনটাই সব প্রশ্নের শেষ উত্তর নয়। মৃত্যুর দরজা দিয়ে আমরা আরেকটি রিফর্মড জীবনে প্রবেশাধিকার পাব, চার মাত্রার ভুবন ছেড়ে বহুমাত্রিক (কিংবা মাত্রাতীত) কোন জগতে প্রবেশ করব। সেই জীবনের সেই জগতের স্বরূপ আমাদের অজানা, তবে তা অবধারিতভাবে আছে। সেই জগতে আমাদের স্থান কোথায় হবে - বাঙলাদেশে হবে নাকি আমেরিকাতে হবে - দোয়াত আলী ও মোসাম্মৎ পরিষ্কার বেগমের পংগু ছেলেটি হয়ে জন্মাব নাকি বিল গেট্সের ঘরে সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মাব - তা নির্ভর করবে আমাদের এ জীবনের কৃতকর্মের উপর। এমনটি যদি হয় তা'হলেই কেবল জীবনের অর্থ কিছুটা পরিস্কার হয়।

আমরা পৃথিবী নামক একটি গ্রহে জীবনস্রোতে আছি এটা প্রমানিত সত্য। মৃত্যুর পরে আমাদের পরিণতি কী হবে তা আমরা জানি না। মৃত্যুর পরে আর কিছু নাই, মৃত্যু জীবনের কমপ্লিট যতিচিহ্ন - এই থিওরী প্রমানিত সত্য নয় । আবার - মৃত্যুই আমাদের অন্তিম পরিণতি নয়, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আরেক ধরণের জীবনচক্রে আমরা প্রবেশ করব - এই থিওরীটিও নিঃসংশয়ে প্রমানিত হয়নি । এই দুইটি অপ্রমানিত থিওরীর মধ্যে কোনটা আমরা গ্রহণ করব ? সাধারণ জ্ঞানে বলে - যে থিওরীতে আমাদের জীবন-জিজ্ঞাসার সঠিক জবাব মেলে সেটিই অধিক গ্রহণযোগ্য - তাই নয় কি ?

(খ):- বিশ্বাস অবিশ্বাসের দন্দ্বযুদ্ধ

আমাদের আলোচনার মুল বিষয়বস্তু ছিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব। ঈশ্বরকল্পনা মুলতঃ মৃত্যুভয় থেকেই উদ্ভুত হয়েছে, তাই প্রথমেই জীবন ও মৃত্যু নিয়ে উপরের আলোচনাটুকু। ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব বিষয়টিতে এসে দার্শনিকরাও দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন - আস্তিক্যবাদী ও নাস্তিক্যবাদী। আস্তিক্যবাদী দার্শনিকরা কার্য্যকারণের সুত্র অবলম্বন করে সৃষ্টির জন্যে একজন স্রষ্টার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। পক্ষান্তরে নাস্তিক্যবাদী দার্শনিকরা স্রষ্টা নাই সরাসরি একথা না বলে স্রষ্টার আদৌ কোন প্রয়োজন নাই বলে সৃষ্টিরহস্যের সমাধান খুজতে চেয়েছেন। আমাদের মতো সাধারণ লোকদের পক্ষে দর্শনশাস্ত্রের সুকঠিন অংগনে প্রবেশ করা সহজ নয়, দার্শনিক আলোচনাও এ প্রবন্ধের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। বরং দর্শন-বিজ্ঞানের বাইরে আমাদের মতো কোটি কোটি আদমসন্তান তাদের সামান্য সাধারণ জ্ঞানকে সম্বল করে কীভাবে এই কঠিন প্রশ্নটির মুখোমুখী হন- বর্তমান প্রবন্ধ তারই একটি আলেখ্যচিত্র মাত্র।

স্রষ্টার অস্তিত্ব কল্পনা করতে যেয়ে সাধারণ জ্ঞান প্রথমেই যে সুত্রটিকে হাতের কাছে পান, তা সেই পুরোনো কার্য্যকারণের সুত্র। প্রকৃতিতে কারণ ছাড়া কোন কার্য্য হয় বলে দেখা যায় না। **'To every effect, there must be a cause'** । একটি আপেল গাছ থেকে নীচের দিকে পড়ে, কারণ আপেলেটির পিছে রয়েছে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণজনিত টান। কালো মেঘের মাঝখান থেকে আলোর ঝলক দেখা যায়, কারণ মেঘের মাঝে রয়েছে বিদ্যুৎ নামক একপ্রকার শক্তি। বেশীদিন রেডিয়াম জাতীয় পদার্থের কাছে থাকলে শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, কারণ রেডিয়ামে রয়েছে পারমানবিক বিকিরণ। অর্থাৎ প্রতিটি কাজের পেছনে একটি কারণ রয়েছে। তাই যদি হয় তা'হলে সৃষ্টিরূপী এই সুবৃহৎ

কাজটির পেছনে নিশ্চয়ই একটি আদি কারণ থাকতে হয়। সেই আদি কারণই ঈশ্বর। এই যুক্তির বিপক্ষে নাস্কিদের কিছু পাল্টা যুক্তি রয়েছে। প্রথমতঃ - সৃষ্টির আদি কারণরূপী কোন ঈশ্বর যদি থেকেই থাকেন, তবে তাকে কে সৃষ্টি করেছে ? অত্যন্ সংগত প্রশ্ন। আস্কিক্যবাদীরা যে যুক্তিতে সৃষ্টির পেছনে একটি আদি কারণ খুঁজতে যান, সেই একই যুক্তিতে বির"দ্ধবাদীরা সেই কারণের পেছনের কারণ খুঁজতে যেতেই পারেন। এর জবাবে আস্কিক্যবাদীরা বলেন - ঈশ্বরের পেছনে কোন কারণ নেই, তিনি কারণাতীত বা স্বয়ম্ভু। নাস্কিক্যবাদীরা একটু মুচকি হেসে বলেন - ওয়েল, ঈশ্বর যদি কারণ ছাড়া হতে পারেন, সয়ম্ভু হতে পারেন - তা'হলে সৃষ্টিরই বা কারণ ছাড়া হতে বাঁধা কোথায় ? সয়ম্ভু হতে বাঁধা কোথায় ?

দ্বিতীয়তঃ নাস্কিক্যবাদীদের ঝুলিতে আরও একটি বড় অস্ সংযোজিত হয়েছে ইদানীং । কোয়ান্টাম মেকানিক্স্ নামক অত্যাধুনিক এক বিজ্ঞানশাস্ অনুসিদ্ধান্ দিয়েছে যে এই বিশ্বে কারণ ছাড়াও কাজ হতে পারে, কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন নামক এক অপার্থিব কারনে সৃষ্টির সুচনা হতে পারে, এর জন্যে ঈশ্বরের দিকে তাকিয়ে থাকার দরকার নেই। (যদিও কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন কী জিনিস এবং তা কেন হয়, কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অন্যতম জনক আইনষ্টাইন পর্য্যন্ তা বুঝতে পেরেছিলেন কিনা জানা যায় না। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অনিশ্চয়তা দেখে আইনষ্টাইন ক্ষোভের সাথে মন্ব্য করেছিলেন - **`God does not play dice'** - ঈশ্বর পাশা খেলেন না)।

আস্কিক্যবাদী ও নাস্কিক্যবাদীদের এই টাগ অব ওয়ারের মাঝখানে পড়ে আমাদের মতো সাধারণ লোকদের হয়েছে অনেকটা যাতাকলে পড়া ইদুরের মতো ত্রাহি অবস্থা। না এদিকে যেতে পারি না ওদিকে, না ঘরকা না ঘাটকা। তবে উভয় ঘরের এই অন্হীন লড়াইয়ের মাঝেও একটা সত্য কিন্তু অত্যন্ উজ্জল। আস্কিক্যবাদীরা সুস্পষ্টরূপে প্রমান করতে পারেন নাই যে ঈশ্বর নামের কোন এক বড়বাবুই এই বিশ্বব্রম্মান্ডের পরিচালক। তারা বড়জোর এইটুকু বুঝাতে পেরেছেন যে মানুষের জন্যে একজন ঈশ্বরের বড়োই প্রয়োজন। পক্ষান্তরে নাস্কিক্যবাদীরাও একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমান করতে পারেন নাই যে ঈশ্বর নামের কোন পদার্থ (নাকি শক্তি?) আদৌ নাই। তারা বড়জোর এইটুকু বুঝাতে পেরেছেন যে বিশ্বব্রম্মান্ডের সৃষ্টির পেছনে ঈশ্বর নামক কোন কল্পনার আশ্রয় না নিলেও চলে। এই দুই অপ্রমানিত অনুকল্পের কোনটিকে জনসাধারণ গ্রহণীয় বলে মনে করবে তা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার হলেও এইস্থানে এসে বিশ্বাস একটা গুর"ত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আমাদের মতো কোটি কোটি সাধারণ নরনারী এই বলে বিশ্বাসকে আকড়ে ধরে যে ঈশ্বর নামক একটি অতিমানবীয় সত্ত্বা আমাদের জীবনজিজ্ঞাসার জন্যে জন্য বড়োই প্রয়োজন। তাকে ছাড়া আমাদের জীবন পরিপুর্ণ হয় না, প্রেমভালোবাসার কোন মানে হয় না, জীবনটাকে একান্ই অর্থহীন বলে মনে হয়। হ্যা, নাস্কিক্যবাদীরা যদি অংক কষে প্রমান করে দিতে পারতেন যে ঈশ্বর নামক কোন সত্ত্বার অস্তিত্ব আদপেই নাই, তাহলে অন্য কথা ছিল। এস্থলে কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন - প্রমান করার দায়িত্ব কি নাস্কিদের একার ? আস্কিরাই প্রমান কর"ক যে ঈশ্বর আছেন। সেক্ষেত্রে আমার যুক্তি হলো - হ্যা, প্রমান করার দায়িত্ব নাস্কিদের একার। যুগে যুগে তাই হয়ে এসেছে। এক কালে মানুষ তার স্থুল বুদ্ধি এবং দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্বাস করতো যে এই পৃথিবীটাই বিশ্বব্রম্মান্ডের কেন্দ্রস্থল। কিছু জ্ঞানী মানুষ যখন চাক্ষুষভাবে প্রমান করে দিলেন যে মানুষের এই যুগসঞ্চিত ধারণা ভুল, মানুষ তখন তা মেনে নিল। মানুষ এখন পর্য্যন্ বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর নামক এক অদৃশ্য সত্তা তাদের জীবন-মরণের নিয়ামক, তিনি সর্বপ্রকার কার্য্যকারণের অতীত, তিনি স্থুল তিনি সুক্ষ্য, তিনি নিরাকার তিনিই সাকার, তিনি প্রথম তিনিই শেষ, তার অস্তিত্বের মধ্যেই মনুষ্যজীবনের সমস্ জিজ্ঞাসার জবাব নিহিত রয়েছে। ঈশ্বরের অনস্তিত্বের অকাট্য প্রমান যদি কারও হাতে থেকে থাকে, তবে প্রমান পেশ করে মানুষের বহুযুগসঞ্চিত

ভুল ধারণা ভেংগে দেওয়ার দায়িত্ব অবশ্যই তার, আস্কিক্যবাদীদের নয়। কারণ আস্কিক্যবাদীদের মতবাদ জনসাধারন তাদের জীবনজিজ্ঞাসার অনুকূলে বলে এমনিতেই মেনে নিয়েছে।

তাহলে দেখা যা"ছ যে কোনপ্রকার বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্যপ্রমান তথা বৈজ্ঞানিক সমীকরণের সাপোর্ট ছাড়াই জনসাধারণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী। কারণ এই বিশ্বাসের মধ্যে তারা তাদের ছোট্ট জীবনের অধিকাংশ প্রশ্নের জবাব পায় (অনেক প্রশ্নের জবাব অবশ্য পাওয়াও যায় না যেগুলির উল্লেখ প্রথমেই করা হয়েছে, তবে প্রথাগত ঈশ্বর-ধারণার উর্ধে উঠতে পারলে সব ধরণের প্রশ্নের জবাবই মেলে)। এখন দেখা যাক, আমাদের মতো সাধারণ বিশ্বাসীরা যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তার স্বরূপটি কীরূপ, তার সাথে আমাদের সম্স্লর্কের ভিত্তিটাই বা কী।

(গ):- আপনারে চিনলে যায় রে অচেনারে চেনা

ঈশ্বর বড়ো গোলমেলে একটি শব্দ। যাকে ধরাছোয়া যায় না, একমাত্র বিশ্বাস ছাড়া যার কাছে পৌছানোর কোন রাস্তা নাই, সেইরকম একটা জিনিসকে নিয়ে কাহাতক আলোচনা করা যায় ? এইজন্যেই বোধ হয় সক্রেটিস সাহেব বলে গেছেন - ঈশ্বরকে বুঝার আগে নিজকে চেন - **`know thyself'**। যে জিনিসকে দেখা যায় না, ধরা-ছোয়া যায় না সেইরূপ একটা অলীক জিনিসকে উপলব্ধিতে আনা খুব কঠিন কাজ। এরূপ ক্ষেত্রে সদৃশ কোন জিনিসের সাথে মিলিয়ে বুঝার চেষ্টা করা একটা অত্যন্ত কার্যকরী কৌশল। মানুষের আত্মা (ংড়ঁষ) এইরূপ আরেকটি গোলমেলে শব্দ যাকে আমরা নিত্যদিন বহন করে চলি অথচ কখনও দেখতে পাই না, দেখার বা বুঝার চেষ্টাও করি না। অথচ আত্মা বলে কোন কিছু যদি সত্যিই থেকে থাকে, তা'হলে সেটাই মানুষের সবচেয়ে কাছের জিনিস হওয়ার কথা। এত কাছের একটি জিনিসকে আমরা বুঝতে পারি না, বুঝতে যাই অলীক স্বর্গের বাশিন্দা কোন্ এক অপার্থিব ঈশ্বরকে ! তাই হয়তো ললন ফকির দুঃখ করে বলেছিলেন - 'ঘরের কাছে হয় না খবর, কী দেখতে যাও দিল্লী লাহোর'। সুতরাং মহাজন-পন্থা অনুসরণ করে নিজের দিকেই প্রথমে দৃষ্টি ফেরানো যাক। যদি সেখানে কিছু পাওয়া যায়, তা'হলে সেই পথ ধরে এগুলে বৃহত্তর কিছু একটা পাওয়া গেলে যেতেও পারে।

আত্মা আসলে কী ? জীবন বা লাইফফোর্স আমরা দেখতে না পেলেও তার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারি। জীববিজ্ঞানের সুত্র অনুসারে কোন পদার্থের ভেতর নিম্নের লক্ষণগুলি প্রকাশিত দেখা গেলে সেটিকে জীবন্ত বা জীবনযুক্ত বলে ধরে নেওয়া হয়:-

১। খাদ্যগ্রহণ - জীব খাদ্যগ্রহণ করে, জড়বস্তু করে না।

২। বৃদ্ধি - জীব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, জড়ের ক্ষয়বৃদ্ধি নাই।

৩। পুনরূৎপাদন - জীবেরা পুনরূৎপাদন করে, জড়েবস্তু তা করে না।

৪। রেসপিরেশন - প্রতিটি জীবন্ত বস্তু শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়, এমনকি গাছপালাও।

৫। মুভমেন্ট - বৃক্ষলতাও নড়াচড়া করে। শাখাপ্রশাখাকে আলোর দিকে মেলে ধরা গাছপালার নড়াচড়া করার উদাহরণ।

৬। মেটাবলিজম, এক্সক্রিশন, সিক্রেশন - প্রতিটি জীবকোষের ভেতর প্রতিনিয়ত নানাবিধ রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটছে জীববিজ্ঞানের ভাষায় যার নাম মেটাবলিজম। জীবদেহ হতে অপ্রয়োজনীয় বস্তুর (যথা মল-মুত্র) নিঃসরণকে এক্সক্রিশন বলে। জীবদেহ হতে অনেক সময় প্রয়োজনীয় বস্তুও নিঃসরিত হয় (যেমন পিত্তরস, মুখগহ্বরের লালা, ফুলের পরাগরেণু ইত্যাদি)। এর নাম সিক্রেশন।

৭। স্পর্শকাতরতা - পারিপার্শ্বিক অবস্থা (যেমন শৈত্য, তাপ, দিন, রাত্রি ইত্যাদি) অনুধাবন ও সেই অনুযায়ী আচরণ করার ক্ষমতা।

৮। অসমোরেগুলেশন - প্রতিটি জীবকোষে পানির পরিমানকে একটি নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় বজায় রাখার ক্ষমতা।

৯। প্রতিটি জীবকোষ প্রোটিন ও নিউক্লিক এ্যাসিড সমন্বয়ে গঠিত।

১০। মৃত্যু - জীবের মৃত্যু অবধারিত। জীবদেহে মেটাবলিজম প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার নামই মৃত্যু।

উপরের বৈশিষ্টগুলি দেখে জীববিজ্ঞানীরা লাইফফোর্সের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হন। জড় বা মৃত বস্তুর মধ্যে উপরের বৈশিষ্টগুলির কোনটিই থাকে না। জীবন্ত বস্তু হতে উপরোক্ত বৈশিষ্টগুলি অন্তর্হিত হলে তা তখন জড়ে রূপান্তরিত হয়। আমরা বলি যে বস্তুটির মৃত্যু ঘটেছে বা তার জীবন চলে গেছে। সুতরাং দেখা যা"ছ যে প্রাণকে ধরতে না পারলেও তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই, সে যে আছে তা আমাদের মেনে নিতেই হয়। কিন্তু আত্মা ? আত্মা বলে আদৌ কিছু আছে কি ? যদি থেকেই থাকে তবে তার স্বরূপ কি ?

একটা উদাহরণ দেয়া যাক। আমরা জানি, বিদ্যুৎ শক্তি প্রকৃতির এক অপরিহার্য উপাদান। সবসময় দেখা না গেলেও সে লুক্কায়িত অবস্থায় সবকিছুর মাঝেই আছে। এই বিদ্যুৎশক্তি যখন কোন রেডিও কিংবা টেলিভিশন যন্ত্রের সংস্পর্শে আসে, তখন সে একটি আকার পায় এবং যন্ত্রটির মাধ্যমে কিছু কাজ করিয়ে নেয়। সেই কাজ একটি গান হতে পারে, হতে পারে একটি মনোহর নাঁচ। কাজ করার ক্ষমতা ও উৎকর্ষতা নির্ভর করে রেডিও কিংবা টেলিভিশন যন্ত্রটির নির্মান-কৌশল এবং ওয়াটেজের উপর। বিদ্যুৎ শক্তি তারের ভেতর নিশ্চল অবস্থায় থাকে। যখনই তা একটি বাল্বের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখনই উজ্জ্বল আলোরূপে তা প্রকাশিত হয়। নিস্প্রাণ বাল্বটি বিদ্যুৎশক্তিকে নিজের মধ্যে ধারণ করে জীবন্ত হয়ে উঠে এবং চারিদিকে আলো বিতরণ শুর" করে। বাল্বটির আলো বিতরণের ক্ষমতা ও স্থায়ীত্বকাল নির্ভর করে বাল্বটির গঠণশৈলী অর্থাৎ এর ফিলামেন্টের উপর। নিরাকার বিদ্যুৎশক্তি একটি আকারে সীমায়িত হয়ে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্যে একটি নির্দ্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করে যায়। বাল্বটির ফিলামেন্ট ছিড়ে গেলে এর মৃত্যু হয়েছে বলা যায়। তবে তাতে বাল্বজন্মের আদি কারণ সেই বিদ্যুৎশক্তির কিছুমাত্র যায় আসে না। বাল্বজন্মের সফলতা বিফলতা নির্ণয় হয় সে তার জীবৎকালে কী পরিমান আলো দিতে পেরেছে তার উপর। অর্থাৎ একটি নিরাকার শক্তি একটি আধারে সীমায়িত হয়ে একটি স্বতন্ত সত্তা হিসেবে আবির্ভুত হয়েছে এবং একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্যে কিছু কাজ সম্পাদন করেছে। ঠিক একইভাবে সেই অনন্ত প্রাণশক্তি বা লাইফফোর্স একটি আধারে সংবদ্ধ হয় এবং একটি আত্মা গড়ে তুলে। এ যেন সেই খাঁচার ভিতর অচিন পাখীর বাসা, মৃন্ময়ের মাঝে চিন্ময়। রবীন্দ্রনাথ কি আর সাধে বলেছেন -"তোমারি মিলনশয্যা হে মোর রাজন, ক্ষুদ্র এ দেহের মাঝে অনন্ত আসন। অসীম বিচিত্রকান্ত ওগো বিশ্বভুপ, দেহে মনে প্রাণে আমি একি অপরূপ"।

আত্মা নামক সেই দুর্জ্ঞেয় পদার্থটির উপর আরও একটু অনুসন্ধান চালানো যাক। ধরা যাক আতাউর রহমান নামক একজন লোক, পিতা বাতেন রহমান, মাতা মোসাম্মৎ রাবেয়া রহমান। উন্নিশ শো সত্তর সালের আগে লোকটির কোন অস্তিত্ব ছিল না। পৃথিবীতে প্রাণপ্রবাহ ছিল, প্রাণশক্তির লীলা সেখানে আজিকার মতোই প্রবাহিত হতো। কিন্তু আতাউর রহমান বলে কেউ ছিল না। দু'জন মানব-মানবীর কোন এক মিলনমুহুর্তে তাদের জৈবিক কামনা-বাসনার নির্য্যাসরূপে সে অস্তিত্বে এসেছিল। প্রাণশক্তি বা লাইফফোর্স একটি আধারে সংবদ্ধ হয়ে একটি আত্মার সৃষ্টি করেছিল, একটি স্বতন্ত সত্তা হিসেবে একজন আতাউরের জীবনগাথা শুর" হয়েছিল।

মাতৃগর্ভেও তার আত্মা ছিল, শৈশবে বাল্যেও তার আত্মা ছিল। কিন্তু সেই আত্মার কোন ভালোমন্দবোধ ছিল না, ছিল না কোন পাপবোধ-পুণ্যবোধ। ক্ষুধা-তৃষ্ণার মতো কিছু প্রাইমারি জৈবিক বোধ ছাড়া আর কোন বোধ হয়নি সেই শিশু আত্মাটির। তা'হলে দেখা যা"ছ - বোধশক্তি আত্মার বাইরের একটি জিনিস যা মানুষকে শ্রমের বিনিময়ে অর্জন করতে হয়।

আতাউরের দেহ ক্রমেই পরিপক্ক হতে থাকল, দেহের সংগে পাল্লা দিয়ে পরিপক্ক হয়ে উঠছে তার আত্মাটিও। তার মস্তিষ্ককোষগুলি বৃদ্ধি পা"ছ, তার দেহ ক্রমেই সুগঠিত হয়ে উঠছে। বিভিন্ন গ্ল্যান্ড হতে বিভিন্নরূপ হরমোন নিঃসৃত হয়ে তাকে একজন সর্বাংগসুন্দর যুবকরূপে গড়ে তুলল। প্রতক্ষ ও অপ্রতক্ষ শিক্ষার বদৌলতে আতাউরের মস্তিষ্কের নিউরোন কোষগুলি পরিপুর্ণ হয়ে গেল। প্রকৃতি ও পারিপার্শিকতা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে সে ধর্ম-কর্ম শিখল, আল্লাহ-রসুল চিনল, ভালমন্দ বুঝল, কামবোধ জানল। দেহের রূপান্তরের সাথে সাথে সে পাপ করল, পুণ্য করল। অর্থাৎ - মায়ের পেটের ও শৈশবের নির্গুণ আত্মাটি গুণবিশিষ্ট হলো। দেহযন্ত্রের বিভিন্ন গ্ল্যান্ড হতে নিঃসৃত হরমোন, পুর্বপুর"ষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জেনেটিক তথ্যাবলী এবং নিউরোনদ্বারা আহরিত পারিপার্শিক তথ্যাবলী -- এই তিনপ্রকারের উপাদানের মিথস্ক্রিয়ার ফলে সে পাপাত্মা হলো, পুণ্যাত্মা হলো। তার শৈশবের নির্গুণ আত্মাটির এই যে রূপান্তর - তা কিন্তু সম্পুর্ন দৈহিক কারণেই ঘটলো ।

মানবাত্মার বিবর্তনের পরবর্তী ধাপগুলিও একটু বিবেচনা করে দেখা যাক। আতাউর বৃদ্ধ হয়েছে, দেহের জীবকোষগুলি নিত্য ক্ষয়প্রাপ্ত হ"ছ কিন্তু নুতন করে জন্মা"ছ না। দেহের যে ভাইটাল অর্গানগুলি তাকে এতদিন টগবগে ঘোড়ার মতো ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, সেগুলির কর্মক্ষমতা কমে গেছে। সে ভালমতো খেতে পারে না, চলতে ফিরতে পারে না। তার চিন্াশক্তি হ্রাস পেয়েছে। এতদিন অরূপরতন, সাকার-নিরাকার ইত্যাদি কতো ভাবনাই না তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। সে লজিকের সাহায্যে ঈশ্বরকে নাই করে দিতে পারত, ধ্যানে বসে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছে বলে পুলক অনুভব করতো। তার মনে প্রেম ছিল, কখনও তা কোন মানবীর প্রতি ধাবিত হয়েছে, কখনও বা ঈশ্বরের প্রতি। এসবকে সে তার পুণ্যাত্মার গুনাগুন ভেবে গর্ব অনুভব করতো। যেই তার দেহযন্টা জড়াগ্রস্থ হয়ে পড়লো, অমনি তার আত্মার সমস্ শক্তি লোপ পেল। তার আত্মা আছে, কিন্তু সেখানে আর প্রেমবোধের সঞ্চার হয় না। তার আত্মা আছে, কিন্তু মনে কোন ঐশী ভাব জাগে না। অর্থাৎ- আতাউরের দেহযন্ত অথর্ব হওয়ার সাথে সাথে তার আত্মাও অথর্ব হয়ে পড়েছে, তার দেহের বিবর্তণের সাথে সাথে আত্মার রূপান্তর ঘটেছে !

আতাউর একদিন কোমায় চলে গেল। তার হৃদপিন্ড, ফুসফুস, কিডনি প্রভৃতি অর্গানগুলি দিব্বি কাজ করছে, শুধুমাত্র ব্রেন কাজ করছে না। চোখ আছে দেখতে পা"ছ না, কান আছে শুনতে পা"ছ না। খেতে পারছে না, ভাবতে পারছে না, অথচ তখনও সে বেঁচে আছে, তার শরীরে প্রাণ আছে। প্রাণের চিহ্ন হ"ছ মেটাবলিজম। আতাউরের দেহে মেটাবলিজম প্রক্রিয়া তখনও চালু আছে, অর্থাৎ সে মৃত নয়। এমনকি লাইফ সাপোর্টিং যন্ত্রের সাহায্যে তার শরীরের মধ্যে প্রাণপ্রবাহ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যে ধরে রাখা যেতে পারে। এই অবস্থায় তার আত্মার অবস্থা কী, আত্মা আছে না চলে গেছে ?

একজন পুর্ণবয়স্ক সুস্থ্যসবল লোক হঠাৎ করে ব্রেনে আঘাত পেল। ফলে তার ব্রেনের কিছু অংশ অচল হয়ে গেল। লোকটি হয়ে পড়লো বদ্ধ উন্মাদ। সে পাগলামীর বশে যে কোন সময় আরেকজন লোককে খুন করে বসতে পারে। ন্যায়-অন্যায় প্রভেদকারী যে নিউরোনগু"ছ তাকে এতদিন চালিয়ে নিয়ে এসেছে যাকে আমরা ন্যায়বোধ বলে আখ্যায়িত করে থাকি, সেই

নিউরোনগু"ছর কার্য্যকারীতা শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে তার মধ্যে আর ন্যায়-অন্যায়বোধ অবশিষ্ট নাই। সে উলংগ হয়ে লোকসমাজে হাজির হতে পারে। যে নিউরোনগু"ছ তার মধ্যে লজ্জা বা শালীনতাবোধ গুনটির জন্ম দিয়েছিল, সেই নিউরোনগু"ছর কার্যকারীতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে তার মধ্যে আর বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ অবশিষ্ট নাই। অর্থাৎ একজন সুস্থ্যসবল লোক শুধুমাত্র একটি অংগ খোয়ানোর ফলে কোন কাজই করতে পারছে না, পাপও করতে পারছে না, পুণ্যও করতে পারছে না। সুতরাং দেখা যা"ছ যে আত্মা মানুষের দেহ-বহির্ভুত কোন বিষয় নয়। দেহের সাথে আত্মা অংগাংগীভাবে জড়িত, কিন্তু প্রাণ নয়। এতকিছুর পরও কি সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকে যে আমাদের দেহরূপী আকারধারী জটিল সিষ্টেমটির টোটাল ফলাফলের নামই আত্মা ? যতক্ষন দেহ আছে, আত্মা নামক একটি বিষয়ের অস্তিত্ব আছে; দেহ অকার্য্যকর হয়ে পড়লে আত্মাও অকেজো হয়ে পড়ে। দেহবিযুক্ত আত্মার ধারণা একটি নামমাত্র, গুনবাচক কোনকিছু তাতে নেই। এ এক চরম অনস্তিত্ব অবস্থা, 'ধ নরম ঘঙ' - নাস্তি। সাধে কি আর মহাপুর"ষরা বলে থাকেন - আত্মা আর কিছু নয় আমার প্রভুর হুকুমমাত্র - 'command from my Lord'। হুকুমের কি কোন অবয়ব আছে যে তাকে ধরা ছোয়া যাবে, কাটাছেড়া করে তার অস্তিত্বকে চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করে তোলা যাবে ? হুকুমটি প্রোটিন ও এ্যাসিডে তৈরী একটি যন্ত্র হিসেবে ঘুরে বেড়িয়েছে কিছুকাল, যন্ত্রটি বিনষ্ট হওয়ার পর হুকুমের আর মুল্য কী থাকে ? 'দেহবিযুক্ত আত্মা একটি অনস্তিত্ব অবস্থা - একটি শুন্য অবস্থা' - এই প্রপজিশনে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। পজিটিভ দিক থেকে বিচার করলে শুন্যতার মাঝেই পরম পুর্ণতা নিহিত আছে, শেষের মাঝে শুর"র ইংগিত আছে।

(ঘ):- আছে অনল অনিলে চির নভোনীলে

আত্মা সম্পর্কে এই প্রসারিত ধারণাটুকু নিয়ে এবার বোধ হয় ঈশ্বর সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা করা যেতে পারে। যদিও মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা নামক যে সত্তা, যাকে আমরা ঈশ্বর নামে অভিহিত করে থাকি, তার স্বরূপ সঠিক ভাবে উপলব্ধি করা মানবীয় জ্ঞানের আয়ত্বাধীন বলে বিশ্বাস করা যায় না। সৃষ্টির বিশালতা ও বৈচিত্রের কথা বিবেচনা করলেই যেখানে মানবীয় জ্ঞান অপর্য্যাপ্ত বলে প্রতীয়মান হয়, সেখানে তার সৃষ্টিকর্তাকে ধরতে যাওয়া একটা অসম্ভব প্রয়াস। অনেকটা অন্ধের হস্তীদর্শনের অনুরূপ। তবুও মানুষ থেমে নেই। যুগ যুগ ধরে সে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে; প্রাণ দিয়ে, মন দিয়ে, কবিতা দিয়ে, সংগীত দিয়ে, ধর্ম দিয়ে, কল্পনা দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে, ভক্তি দিয়ে, প্রেম দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, বিজ্ঞান দিয়ে, অবিজ্ঞান দিয়ে – অর্থাৎ মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তির সবগুলো উপকরণ দিয়ে মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে। মানুষের এই অন্তহীন অভিযাত্রার ফল কতটুকু মিলেছে, তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। তবে জগতের শ্রেষ্ঠতম কবিতাটি আর শ্রেষ্ঠতম সংগীতটি যে না পাওয়ার এই মহৎ বেদনা থেকেই উৎসারিত - তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ঈশ্বর কী বা ঈশ্বর কে - এই প্রশ্নের জবাব মানুষের হাতে নেই। মানুষের অন্তহীন জিজ্ঞাসার বিশ্বাসভিত্তিক উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে ধর্মে, বুদ্ধি বা প্রজ্ঞাভিত্তিক উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে দর্শনে। ঈশ্বরোপলব্ধির তাড়নায়ই মানুষ আত্মোপলব্ধিতে উৎসাহিত হয়েছে, আত্মার পথ ধরে পরমাত্মায় পৌছুতে চেয়েছে। ইতিপুর্বে আমরা দেখেছি - নিরাকার নিরাবলম্ব নিরাবয়ব নির্বেদ বিমুর্ত অজ্ঞাতপুর্ব অজানা রহস্যময় এক প্রাণশক্তি কিছুকালের জন্যে একটি দেহের মধ্যে সংবদ্ধ হয়ে একটি স্বতন্ত্র সত্তায় মুর্ত হয়ে একটি আত্মার প্রকাশ ঘটায়; গ্রামবাংলার চারণকবির কাব্যিক অনুভুতিতে যা ক্ষনস্থায়ী একটি বুদবুদ হিসেবে ধরা দিয়েছে - "জলে বায়ু হলে আটকা, ক্ষনেকারে নাম ধরে ফুটকা, জাতের বায়ু দিলে ঝটকা, জাতে জাতে মিশা যায়"। মৃত্যুর পর 'জাতের বায়ু জাতে জাতে মিশা যায়' - অর্থাৎ প্রাণশক্তি সেই মহাপ্রানে বিলীন হয়ে যায়। আত্মা তার গুনবাচক বা কর্মবাচক অস্তিত্ব হারিয়ে শুধুমাত্র একটি নামবাচক অস্তিত্ববস্থায় ফিরে যায়, যা প্রায় অনস্তি

ত্ববস্থা বা শূন্যাবস্থার কাছাকাছি। কেউ যখন বলে যে মৃত্যুর পর আত্মা বলে কিছু থাকে না তার কথা যেমন পুর্ণ সত্য নয়, ঠিক সেইভাবে কেউ যখন বলে যে মৃত্যুর পরও আমার আত্মাটি পার্থিব সত্তার মতোই পুর্ণভাবে বিরাজ করে - তার কথাও পুর্ণ সত্য নয়। এ এমন একটি অবস্থা যেখানে এসে আস্তি ও নাস্তি একবিন্দুতে মিশে গেছে। ঠিক যেন গণিতশাস্ত্রের শূন্য। গনিতের শূন্য একটি সংখ্যা, অথচ কনসেপশনের দিক থেকে বিচার করলে শূন্য মানে কোনকিছু না থাকা। শূন্য একই সংগে আছে এবং নেই। শূন্য একটি অবস্থান যেখান থেকে পজেটিভ ও নেগেটিভ সংখ্যাগুলির লীলাখেলা শুর" হয়ে অসীমের দিকে ধাবিত হয়েছে। ঠিক একইভাবে আত্মার নামবাচক অবস্থা গনিতের শূন্যের মতোই একটি অবস্থা যেখানে এসে ধনাত্মক বিশ্বাস ও ঋণাত্মক বিশ্বাস একসংগে এসে মিলিত হয়। এ প্রসংগে বিজ্ঞানের বিগ-ব্যাংগ তত্ত্বটির উল্লেখ করা যেতে পারে। ইদানীংকালে বিজ্ঞানীরা সৃষ্টিরহস্যের মুলবিন্দুতে পৌছতে যেয়ে অংক কষে এক 'অদ্বৈতবিন্দু'র (ংরহমঁষধৎরঃু) সন্ধান পেয়েছেন যেটাকে তারা 'বিগ-ব্যাংগ' নামে অভিহিত করে থাকেন। এই থিওরীর মতে মহাবিশ্বের যাত্রা শুর" হয়েছিল অসীম ঘনত্ববিশিষ্ট একটি বিন্দু থেকে। এই বিন্দুর পুর্বে কী ছিল বিজ্ঞান তার ব্যাখ্যা দিতে পারে না, কারণ এই বিন্দুতে আসলে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সমস্ত সুত্র অচল হয়ে পড়ে। সংজ্ঞা অনুযায়ী বিন্দু এমন একটি জিনিস যার শুধুমাত্র অস্তিত্ব আছে, কিন্তু কোন মাত্রা নাই, অর্থাৎ দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ কিছুই নাই, ঠিক যেন একটা শূন্য, মহাশূন্য। বিগ-ব্যাংগ মুহুর্ত যেন মহাবিশ্বের প্রসববেদনার মুহুর্ত, মাত্রাতীতের মাত্রার ভেতর আত্মপ্রকাশের মুহুর্ত, অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে উত্তরণের মুহুর্ত, নির্গুণ অবস্থা থেকে সগুণ অবস্থায় আত্মপ্রকাশের মুহুর্ত। বিগব্যাংগ মুহুর্ত থেকে বিশ্বের (বিজ্ঞানের ভাষায় স্থানকালের) যাত্রা শুর"। এই বিন্দু থেকে যাত্রা শুর" করে প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী সে বিবর্তিত হয়েছে, কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে পদার্থ, শক্তি। সৃষ্টি হয়েছে নীহারিকা, ছায়াপথ, তারকাপুঞ্জ, গ্রহমন্ডলী। সৃষ্টি হয়েছে প্রাণ, জীবজগত ও মানুষ। সৃষ্টি হয়েছে আইনষ্টাইন - রিলেটিভিটির সুত্রের পথে যিনি সৃষ্টিকর্তাকে ধরতে চান। সৃষ্টি হয়েছে রবীন্দ্রনাথ - ছন্দের মাধ্যমে যার মুখে সবাক আত্মোপলব্ধি - 'আকাশ ভরা সুর্য্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ, তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান'।

ঈশ্বরের নামবাচক অবস্থাও (আরবী ভাষায় যাকে এছমে জাত বলে অভিহিত করা হয়) অনেকটা দেহহীন আত্মার অনুরূপ, যার শুধুই অস্তিত্ব আছে কোন প্রকাশ নাই। 'দেহবিযুক্ত আত্মা একটি অনস্তিত্ব অবস্থা - একটি শূন্য অবস্থা', ঠিক সেইরূপ সৃষ্টিপর্য্যায়ের পুর্ববর্তী ঈশ্বরও যেন দেহহীন একটি আত্মা। শুধুমাত্র নামটি মাত্র সম্বল করে তিনি শূন্যবিন্দুতে অবস্থান করেন। তিনি গুপ্ত ছিলেন নির্গুণ ছিলেন, প্রকাশিত হওয়ার ঐশী আকাংখায় তিনি গুণবিশিষ্ট হলেন। তার গুনবাচক অবস্থার ফলাফলই এই বিশ্বপ্রকৃতি। মহাবিশ্ব সেই মহাসত্তার রচিত অনুপম মহাকাব্য যার প্রতিটি ছত্রে প্রতিটি পত্রে তিনি মিশে আছেন। আছেন "অনল অনিলে চির নভোনীলে ভুদরে সলীলে গহনে, আছে বিটপীলতায় জলদেরই গায় শশী তারকায় তপনে"।

এখানে একটি মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন এসে যায় -- 'তা'হলে এই বিশ্বপ্রকৃতিই কি ঈশ্বর'? অত্যন্ত সংগত প্রশ্ন, যদিও জবাবটা তার চেয়েও বেশী কঠিন। দার্শনিকেরা এই প্রশ্নের জবাব কীভাবে দিয়েছেন জানি না, তবে মরমী সুফি-সাধকরা কীভাবে এই প্রশ্নের মুখোমুখী হয়েছেন তার একটুখানি আভাস দেওয়া যেতে পারে। যদি আমরা ঈশ্বর নামক একটি নামবাচক সত্তার পুজাই করি, তা'হলে তার স্বরূপ জানা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ নামরূপী ঈশ্বর সমস্ত মানবীয় জ্ঞানের অতীত। নামরূপী ঈশ্বর যেন বিগ-ব্যাংগ মুহুর্ত, সেখানে সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক সুত্র অচল। তবে যে বিন্দুতে এসে তিনি প্রকাশিত বা গুনবিশিষ্ট হয়েছেন, সেই মুহুর্ত থেকে তার স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব, কারণ গুনবিশিষ্ট জিনিস মানবীয়

জ্ঞানের আয়ত্বাধীন। সুফী সাধকরা তাই বিশ্বপ্রকৃতিকে ঈশ্বরের ছায়া বা দর্পণ হিসেবে অনুভব করে থাকেন যার মধ্যে ঈন্দ্রিয়াতীত অবাঙমানসগোচর অনন্ত সত্তাটি প্রতিবিম্বিত হন প্রতিক্ষণ। লালন ফকিরের ভাষায় - "জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়, ধরতে গেলে কে তারে পায়, তেমনি সে থাকে সদাই ফলেতে বসে"।

মানুষের চিন্াশক্তির একটা লিমিটেশন আছে যার বাইরে যাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বিজ্ঞানশাস্ত্রও যেহেতু মানুষের তৈরী, সুতরাং বিজ্ঞানশাস্ত্রেরও একটি লিমিট থাকা অবধারিত। বিজ্ঞানের যেসমস্ত সমীকরণ বিশ্বপ্রকৃতি নিয়ে কাজ করে সেগুলিতে অবধারিতভাবে দুইটি ফ্যাক্টর লক্ষ্য করা যায় - লিমিট টেন্ডস টু জিরো (খঃ⟶০) এবং লিমিট টেন্ডস টু ইনফিনিটি (খঃ⟶∞)। জিরো এবং অসীম - এই দুই প্রান্তবিন্দুর মধ্যে বিজ্ঞানের বিচরণ, এর বাইরে নয়। জিরো এবং ইনফিনিটি যদিও অংকশাস্ত্রে দুইটি সংখ্যার ন্যায় ব্যবহৃত হয়, তবুও এই সংখ্যা দুইটির প্রকৃত স্বরূপ আজও মানুষের অজানা। সংখ্যা দু'টিকে দুই প্রান্তের দু'টি খুটির মতো ধরে নেয়া হয়েছে এইমাত্র। ঈশ্বর বলে যে সত্তাটি আমাদের কল্পনায় আছেন তিনি স্থানকালের অতীত, অর্থাৎ অংকশাস্ত্রের জিরো ও ইনফিনিটি সংখ্যাদ্বয়ের বাইরে। সুতরাং কোন বিজ্ঞানের থিওরী দিয়ে তাকে মাপতে যাওয়া বাতুলতা। তিনি মানুষের কল্পনায় বাস করেন, বিজ্ঞানের সমীকরণে নয়। মানুষের কল্পনার ব্যপ্তি সীমাহীন, তা কোন নিয়মনিগড়ে আবদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে বিজ্ঞানের সমীকরণ কঠোরভাবে নিয়মনিগড়ে আবদ্ধ। সমীকরণ কিছুতেই মানুষকে আলোর চেয়ে দ্রুতবেগে ছুটাতে পারমিট করে না। কিন্তু মানুষের কল্পনা ইচ্ছে হলেই আলোর চেয়ে সহস্রগুন বেশী বেগে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। ভাষা দিয়ে আমরা তাকে প্রকাশ করতে প্রয়াস পাই, কিন্তু তিনি ভাষারও অতীত। মন দিয়ে তাকে আমরা বুঝতে চাই, কিন্তু তিনি মনেরও অতীত। তিনি অবাঙমানসগোচর। যুক্তি দিয়ে তাকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করা যায় না, যেমন যায় না অপ্রমান করা। কারণ তিনি সমস্ত যুক্তি-তর্কের অতীত। আদিতেও তিনি আছেন, অন্তেও তিনি আছেন। বিশ্বাসীদের হৃদয়ে তিনি আছেন, আকাশপৃথিবী পরিপূর্ণ করে আছেন।

(ঙ):-আমি কোন জন সে কোন জনা

ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্ক কী ? স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক মাত্র ! মানুষ বিধাতার হাতে গড়া অত্যন্ত উন্নতমানের কমপিউটার যন্ত্রবিশেষ, এর বেশী কিছু নয় ? তাই যদি হবে তা'হলে কেন স্বর্গ-নরকের অলীক স্বপ্ন দেখানো, কেন ভাল কাজের তাগিদ, মন্দ কাজের নিষেধ ? কেনই বা পাপপুন্যের জন্যে মানুষকেই দায়ী করা ? কমপিউটারের ম্যাল-ফাংশনিংয়ের জন্যে যন্ত্রটি নিজে দায়ী হবে কেন ? সে তো বলতেই পারে - 'তুমি যেমনি নাঁচাও তেমনি নাঁচি পুতুলের কি দোষ' ? পুরোনো অকেজো কমপিউটার - তা সে যতো প্রিয়ই হোক - তাকে গার্বেজ না করে কে কবে তার জন্যে রাজপ্রাসাদ বানায়, সুরম্য রাজপ্রাসাদের দামী শো-কেসে যত্ন করে সাজিয়ে রাখে ? মানুষের সাথে স্রষ্টার কি এমনি স্রষ্টাসৃষ্টির সম্পর্কমাত্র ?

আরও এক ধরণের স্রষ্টাসৃষ্টি সম্পর্ক দেখা যায় যেখানে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির প্রাণের যোগ থাকে। পিতামাতার সাথে সন্তানের সম্পর্কটি এই ধরণের একটি সম্পর্ক। সন্তান পিতামাতার প্রত্যক্ষ সৃষ্টি, অথচ পিতামাতার সাথে সন্তানের প্রাণের যোগ রয়েছে। সে পিতামাতার প্রতিনিধি বা খলীফা, তাদের উত্তরাধিকার। সন্তান পিতামাতার সৃষ্ট একটি স্বতন্ত সত্তা হয়েও দেহের প্রতিটি কোষে জন্মদাতার প্রতিচ্ছবি ধরে রাখে, সন্তানের মাঝে পিতামাতা প্রতিবিম্বিত হন। সন্তানের মংগলের জন্যে পিতামাতা অহোরাত্র ব্যতিব্যস্ত থাকেন, তার মংগলে সর্বান্তকরণে সুখী হন, অমংগলে দুঃখে অধীর হয়ে পড়েন। ভাল কাজ করলে পুরষ্কার দেন, মন্দ কাজ করলে তিরষ্কার করেন। বিশ্ববিধাতার সাথে মানুষের সম্পর্কের সুত্রটা যদি সেইরূপ

কোন আত্মিক সুতায় বাঁধা থাকে, তাহলেই কেবল স্বর্গনরক বা ইহকাল পরকালের মর্মার্থ কিছুটা হলেও পরিস্ফুট হয়। ঈশ্বর ও মানুষের সম্পর্কটাকে কুমোর-হাড়িপাতিলের সম্পর্কের মতো সম্পর্ক দিয়ে বাঁধতে গেলে শেষ গন্তব্যস্থল যে গো-ভাগাড় তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বস্তুতঃ ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্ক অনুভবের বিষয়, যোগবিয়োগ বা পুরণভাগ দিয়ে সমীকরণে ফেলে কাটছেড়ার বিষয় নয়। এ যেন তরুনতরুনীর প্রেম - কেন হলো কীভাবে হলো - কোন কারণ কোন লজিক খুঁজে পাওয়া যাবে না। শুধু তরুনতরুনীর মনই জানে, তাদের একজনকে বাদ দিয়ে আরেকজনের জীবন মিথ্যে - অর্থহীন। মানুষের মাঝেও একশ্রেণীর লোক আছেন যারা প্রেমের মাধ্যমে সুষ্টিকর্তার কাছে পৌছতে চান। ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্কটা যাচাই করতে আমরা এবার প্রেমপথযাত্রী সেইসব আধ্যাত্মবাদীদের দুয়ারে হানা দেব, এই সম্পর্ককে আধ্যাত্মবাদীগন কোন চোখে দেখেন তার উপরে কিঞ্চিত আলোকপাত করব।

আধ্যাত্মবাদ ধর্মদর্শনের একেবারে নিগুঢ়তম অধ্যায়, ইংরেজীতে যাকে বলে কন্ডেনসেট। আধ্যাত্মবাদের সাধকগন প্রেমের পথ ধরে ঈশ্বরের কাছে পৌছুতে চান, কারণ প্রেমের চেয়ে শক্তিশালী কোন মাধ্যম এই সৃষ্টিতে দ্বিতীয়টি আছে বলে মনে হয় না। তাদের প্রচেষ্টার নীট রেজাল্ট কী, তার নির্ভরযোগ্য বিবরণ মিলে না। এই পথের সাধক যারা, তারা তাদের অনুভুতিকে একটা গোপনীয়তার আড়ালে রাখতেই বেশী পছন্দ করেছেন। দয়িতের সাথে দয়িতার মিলনমুহুর্তটি একান্ত ভাবেই তাদের নিজস্ব ধন, সেখানে দশজনের প্রবেশ মুহুর্তটির গোপন মাধুর্য্য নষ্ট করে ফেলে। তবে কবিতায় বা গানে তাদের যে অন্তর্জালা প্রকাশিত, তা পরখ করে দেখলে বিষয়টি সম্পর্কে যে ধারণা জন্মে তাতে মনে হয় যেন আধ্যাত্মবাদের একটা বিশেষ পর্য্যায়ে এসে সাধক নিজের মাঝে ঈশ্বরকে প্রতিবিম্বিত দেখতে পান - সেই অসীম সত্তায় নিজেকে বিলীন দেখতে পান। 'নাফাকতুহু মিন র"হি' - তোমার মাঝে আমার আত্মা ফুকে দিলাম - এই বাণীর বাস্ব প্রত্যক্ষ হয় তার জীবনে। সে অনুভব করে - তার মাঝে প্রবাহিত হ"ছ বিশ্বাত্মা। সেই অসীম বিশ্বাত্মার প্রেম পরশে সাধকের মন আলোকিত হয়ে উঠে, তার কানে বেজে উঠে ঐশ্বরিক ছন্দ। হাজার বছর আগে ভারতের নিভৃত তপোবনে ধ্যানরত ঋষির মনে একটি মহা ভাব জন্ম নিয়েছিল - 'অহম ব্রম্মাস্যি' - আমিই ব্রম্ম। এর হাজার বছর পরে আরবের বিরাণ মর"ভূমিতে সম্পুর্ণ আলাদা গোত্রের একজন মানুষের কণ্ঠেও সেই একই সুর শুনি - 'আনাল হক্ক' -আমিই সত্য। সেই একই অনুভুতি দেশকালের গন্ডী অতিক্রম করে গ্রামবাংলার শ্যামল মাটিতে বাউলকবি লালনের মুখেও সমান তালে ঝংকৃত হয়ে উঠে - 'আমি কোনজন সে কোন জনা'। নগর বাউল রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতায় ও গানের মাঝেও সেই অভিন্ন সুরেরই দ্যোতনা - 'কণ্ঠে আমার কী গান শুন, অর্থ আমি বুঝি না কোন, বীণাতে মোর বাজিয়া উঠে কাহার ভৈরবী'। বস্তুতঃ আধ্যাত্মপথের পথিক যারা, তাদের জীবনব্যপী সাধনাকে বিশ্লেষণ করলে একটা সত্যই স্পষ্ট হয়ে উঠে। সে সত্য এই যে - এরা সকলেই একটা বিশেষ পর্য্যায়ে এসে নিজেকে ঈশ্বরের সাথে একাত্ম ও অভিন্ন সত্তা হিসেবে অনুভব করেছেন, মৃন্ময়ের মাঝে চিন্ময়ের প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন।

কেউ কেউ হয়তো এইসব অতীন্দ্রিয় অনুভুতিকে মনের বিকার, হ্যালোছিনেশন, মুর্খের ভাববিলাস বলে উড়িয়ে দেবেন। বিজ্ঞানের দুই প্রান্তের (জিরো ও ইনফিনিটি) বাইরের কোন কিছুকে তারা পাত্তা দিতে চান না। তা না দিন, সে অধিকার তাদের পুরোমাত্রায় রয়েছে। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি বিজ্ঞানকে এত ছোট গন্ডীতে ফেলে দেখি না। বিজ্ঞানের পরিসর অতি ব্যপক, এর সম্ভাবনা অসীম। এর শিকড় সেই পরম বিজ্ঞানীর মুলগ্রন্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কে জানে যে আগামীতে আরও

কোন নূতন বিজ্ঞানের বদৌলতে সৃষ্টিকর্তার আরও নিকটে আমরা পৌছে যাব না ? মাত্র শত বছর আগেও কি মানুষ ভাবতে পেরেছিল যে সৃষ্টিরহস্যের এত কাছাকাছি সে পৌছে যেতে পারবে ? একটি সিঙ্গল সেলকে কালচার করে একটি পূর্ণাংগ মানুষ তৈরী করতে পারবে ? ঈশ্বরের দিকে পৌছানোর দুইটি রাস্তা - এক জ্ঞানমার্গ, দুই ভক্তিমার্গ। ভক্তিমার্গ তথা প্রেমমার্গ সুফী সাধকদের পথ, পক্ষান্তরে জ্ঞানমার্গ বিজ্ঞানীদের পথ। এক পথে মনসুর, লালন ফকির, রবীন্দ্রনাথদের যাত্রা - আরেক পথে গ্যালিলিও, নিউটন, আইনষ্টাইনদের যাত্রা। উভয়ের গন্তব্যস্থল একই - সৃষ্টিরহস্যের মুলবিন্দুতে পৌছানো তথা ঈশ্বরের মনকে জানা। লক্ষ্য এক, শুধু পথই আলাদা। এদের সাধারণ পরিচয় একটাই, এরা সবাই সত্য পথের পথিক।

(চ):-কেমনে হয় তার মনের খবর

আধ্যাত্মবাদী তথা অতিন্দ্রীয়বাদীদের দৃষ্টিকোন থেকে স্রষ্টাসৃষ্টির সম্পর্ক এতক্ষন বিস্তর আলোচনা হলো। একটা প্রশ্ন কিন্তু এখনও রয়েই গেছে - বিশ্ববিচিত্র এই সৃষ্টিকান্ডের পেছনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কী ? তিনি কি বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্বসৃষ্টি করেছেন, না সবই তার খেয়ালি মনের খেলা মাত্র। এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া আর ঈশ্বরের মন পড়তে পারা একই কথা। দর্শন বিজ্ঞান এ নিয়ে যুগের পর যুগ কলহ করে মরছে, উত্তর কোথায় ? এর জবাব খুঁজতে আমরা আবারও হানা দেব আধ্যাত্মবাদীদের দুয়ারে, তারা বিষয়টিকে কীভাবে বুঝতে চেয়েছেন তা দেখা যাক।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন - 'মানুষ যেন হারিয়ে যাওয়া এক রাজকুমার যে নিজের পরিচয় নিজে জানে না। সে জানে না যে সামান্য নয়, সে রাজার ছেলে'। বিশ্ববিধাতা তার সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে অরূপ থেকে রূপময় ভুবনে অবতরণ করেছেন, তার জ্যোতিই সৃষ্টির মুল কারক। কিন্তু মানুষের মাঝে তার প্রকাশ ব্যতিক্রমধর্মী প্রকাশ। মানুষ যেন সমস্ত সৃষ্টিজগতের নির্য্যাস, মানুষের মাঝে তিনি মাধুর্য্যভজন করেন। তিনি প্রেমে উত্তাল হয়ে উঠেন এই মানবহৃদয়ে, আর কোথাও নয়। বিমুর্ত অনস্তিত্বতা থেকে তিনি অবয়বে আসেন এই আদমসুরতেই। ছন্দের গীতাঞ্জলী হয়ে গলে পড়েন মানুষেরই হাতে। ক্রুশবিদ্ধ যিশুর হৃদয় দিয়ে তিনি অন্যায় দন্ডের যন্ত্রণা ভোগ করেন, সক্রেটিসের হাত দিয়ে হেমলক পান করে বেদনায় নীলকণ্ঠ হন, কুষ্ঠরোগীর হৃদয়পদ্মাসনে বসে বেদনার্ত ছন্দে বিগলিত হন তিনিই। লালন ফকিরের ভাষায়-

'অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই
শুনি এই মানুষের উত্তর কিছুই নাই
দেবদেবতাগন করে আরাধন জন্ম নিতে মানবে।
এই মানুষে হবে মাধুর্য্যভজন
তাইতে মানুষরূপ গড়লেন নিরঞ্জন'।

স্রষ্টা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অনুভুতিও লালনের প্রায় কাছাকাছি। তার মতে মানবসত্তা ঈশ্বরের মায়ার প্রকাশ, মানুষ তথা সৃষ্টিপটে তিনি অবিরাম তার মানসছবি অংকন করে যা"ছন। মানুষ যেন ঈশ্বরের সোনা বোঝাই করার ভেলা মাত্র, মানুষ যদি মুকুলটি হয় তা'হলে ঈশ্বর তার সুবাস —

"আমার মাঝে তোমারি মায়া জাগালে তুমি কবি
আপন পটে আঁক মানস ছবি

তাপস তুমি, হেয়ালি তব, কী দেখ মোরে কেমনে কব
আপন মনে মেঘ স্বপনে আপনি রচ রবি।
তোমারই সোনা বোঝাই হলো আমি তো তার ভেলা
নিজেরে তুমি ভুলাবে বলে আমারে নিয়ে খেলা
কণ্ঠে আমার কী গান শুন, অর্থ আমি বুঝি না কোন
বীণাতে মোর বাজিয়া উঠে তোমারি ভৈরবী
মুকুল মম সুবাসে তব গোপনে সৌরভি।"

(ছ):- শেষ কথা

ঈশ্বর অনন্ত এবং সান্ত, ঈশ্বর নিরাকার এবং সাকার, ঈশ্বর রূপ এবং অরূপ, ঈশ্বর প্রথম এবং শেষ, ঈশ্বর শুন্য এবং পুর্ণ, ঈশ্বর গোপন এবং প্রকাশ, ঈশ্বর দৃশ্য এবং অদৃশ্য, ঈশ্বর জ্ঞেয় এবং অজ্ঞেয়, ঈশ্বর প্রেম এবং অপ্রেম, ঈশ্বর আনন্দ এবং বেদনা, ঈশ্বর কার্য্য এবং কারণ, ঈশ্বর কবি এবং কবিতা, ঈশ্বর গুন এবং নির্গুন, ঈশ্বর গাছ এবং ফল, ঈশ্বর জন্ম এবং মৃত্যু। তার থেকেই আমি এবং আমা থেকেই তিনি। তার থেকেই আমি আগত এবং তার দিকেই আমি প্রত্যাগত। তিনিই বিশ্ব সৃষ্টির মুল বিন্দু। তার প্রতি প্রেম এবং বিশ্বাসই আমার বেঁচে থাকার প্রেরণা। তার বাণী কানে শুনা যায় না, প্রাণে শুনতে হয়। পত্রে-পল্লবে, ফুলে-ফুলে, গানে-গানে, তারায়-তারায় প্রকাশিত তার বাণীর প্রতি হৃদয় মেলে রেখেছি অনুক্ষন। জীবনে যদি সেই বাণী নাও শোনা যায়, মৃত্যুর মাঝে তা শুনব এই বিশ্বাস নিয়েই বেঁচে থাকা আমাদের। অবিশ্বাস নিয়ে জেতার চেয়ে নিজের বিশ্বাস নিয়ে ঠকাও শ্রেয়। কবিগুর" বর্ণিত সেই কৃপণ ভিক্ষুকের কাহিনী বলে অত্র প্রবন্ধের ইতি টানতে চাই। এক যে ছিল ভিক্ষুক, সে ছিল খুবই কৃপণ। পারতপক্ষে তার হাত দিয়ে কোন কিছু গলতে চাইত না। একদিন সকালবেলা ভিক্ষায় বের"নোর আগে সে সংবাদ পেল, আজ দেশের রাজা রাজপথে বের"বে। শুনে ভিক্ষুক বেজায় খুশী। ভাবল রাজার যাত্রাপথে সে বসে থাকবে। রাস্া দিয়ে যাওয়ার সময় রাজা দু'হাত ভরে ধনধান্য ছিটাবে, সে ঝুলি ভরে তা ঘরে নিয়ে আসবে। কিন্তু একি অবাক কান্ড, রাজাধিরাজের স্বর্ণরথটি হঠাৎ করে তার সামনে এসে দাড়িয়ে পড়ল। রাজা রথ থেকে নেমে এসে ভিক্ষুকের কাছে হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'আমায় কিছু দাও গো বলে বাড়িয়ে দিল হাত'। রাজার প্রার্থণা শুনে ভিক্ষুক মাথা নীচু করে রইল। এ কোন ধরণের কৌতুক রাজার ! ভিক্ষুক মনে মনে ভাবল - "তোমার কিবা অভাব আছে, ভিখারি ভিক্ষুকের কাছে, এ কেবল কৌতুকের বশে আমায় প্রবঞ্চনা, ঝুলি হতে বাড়িয়ে দিলেম ছোট্ট একটি কণা"। কৃপণ ভিক্ষুক, প্রাণ ধরে ছোট্ট একটি শস্যের দানা সে রাজার হাতে তুলে দিল। সেই শস্যদানা হাতে নিয়ে রাজা রথে উঠে চলে গেলেন। সন্ধেবেলা ঘরে ফিরে ভিক্ষুক যখন তার ভিক্ষার ঝুলিটি উজার করে ঢালল - সে অবাক হয়ে দেখতে পেল - তার ভিক্ষালব্ধ জিনিষের মধ্যে ছোট্ট একটি সোনার কণা। সে বুঝতে পারল, রাজভিখারিকে সে যে ছোট্ট শস্যকণাটি দিয়েছিল তাই শতগুনে বর্ধিত হয়ে সোনা হয়ে ফিরে এসেছে। অনুশোচনায় ভরে গেল তার মন। হায়, সে যদি কৃপণতা না করে ঝুলির সবকিছুই রাজার হাতে তুলে দিতে পারত !

"যবে পাত্রখানি ঘরে এনে উজার করি - একি
ভিক্ষামাঝে ছোট্ট একটি ছোট্ট সোনার কণা দেখি !
দিলেম যা রাজ-ভিখারিরে স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে-
তখন কাঁদি চোখের জলে দু'টি নয়ন ভরে

তোমায় কেন দিইনি আমার সকল পুর্ণ করে ?”

রাজারও কখনো কখনো ভিক্ষাবিলাসের লিপ্সা হতে পারে, প্রজার কাছে কাছে রাজারও কিছু চাওয়ার থাকতে পারে ! গল্পের ভিখারির মতো কৃপণ হয়ে অনুশোচনা করার চেয়ে একটু অকৃপণ হলে তাতে কার কতটুকুই বা ক্ষতি ?

মেজবাহউদ্দিন জওহের
e-mail: mezbahmezbah@hotmail.com
জানুয়ারি ০৯, ২০০৪ সাল